বাঘিনি

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

আজ সকালে কাগজে ছোট্ট একটা খবর পড়ে মনটা বড্ড দমে আছে। শহরের কয়েকটা বাড়িকে শনাক্ত করা হয়েছে বিপজ্জনক বলে। খুব শিগগির সেগুলো ভেঙে ফেলবে কর্পোরেশন। এমন খবরে আমার দমে যাওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। দমে গেলাম বিশেষ একটা বাক্যে, যেখানে বলছে, ভাঙার জন্য শনাক্ত করা বাড়িগুলোর মধ্যে ১৪ নম্বর মিন্টো রোর ক্লাসিক্যাল স্থাপত্যের বাড়িটিও, যেখানে এককালে বাস করেছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নর্তকী লাশিয়াস লোলা যার আসল নাম লোরেন সুইন্টন, যেখানে তাঁর কৈশোরে প্রায়শ আসতেন পরবর্তীকালে হলিউডের বিশ্রুত নায়িকা মার্ল ওবেরন, আর যে বাড়িতে মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছিলেন বিখ্যাত ব্যাঘ্র শিকারি টম ফিলপট।

খবরটা পড়ার পর কিছুক্ষণ শ্বাস চেয়ে বসেছিলাম। মনে পড়ছিল বাল্যের সেইসব দিন, যখন সন্ধ্যে নামলে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম ওই বাড়ির ছাদের দিকে, ভূত দেখব বলে। পাড়ার লোকের মুখেই শুনতাম সন্ধ্যেকালে ১৪ নম্বরের ছাদে ভূত নামে। দূর দূর থেকে আগুনের গোলা দেখা যায়, দৌড়োচ্ছে ছাদের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। আশপাশ থেকে শোনা যায় কান্না

কি গোঙানির শব্দ। কথা নেই, বার্তা নেই, ছাদ থেকে রাস্তায় নেমে আসে গলায় ফাঁস দেওয়ার দড়ি। পথ চলতে যে তা দেখে, তারই নাকি সাধ হয় ওই ফাঁসের গেরো গলায় পরার। রঞ্জু পোপা নাকি গাঁজায় চুর হয়ে একবার গলায় গলিয়েও ফেলেছিল ওই ফাঁস; তারপর হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে সে কী কান্না ওর। ও দিকে সামনে হ্যাঁচকা টান শূন্য থেকে। কেউ যেন ছাদ থেকে টান মেরে জমি থেকে উপড়ে নিচ্ছে দশাসই মানুষটাকে।

মনে পড়ল পাগলি রেচেল পার্টনকে, যাকে ভালোবাসতেন শিকারি ফিলপট। ফিলপটেরই উপহার করা বাঘছালে মোড়া আর্মচেয়ারে বসে সারাক্ষণ বিড়বিড়, বিড়বিড় করত রেচেল। যখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ি, টের পেলাম মহিলা ফিলপটের মিস্ট্রেস। শোনামাত্র জিব কেটেছিলাম—সে কী, অতবড়ো শিকারি শেষে একটা পাগলির পাল্লায় পড়ল! তখন বন্ধু সঞ্জীব খেকিয়ে উঠল, পাগলি তো কী হয়েছে? মেয়েটার কী চেহারা দেখেছিস কখনো? তোর ওই সুচিত্রা সেন-ফেন ঘেঁষতে পারবে না। সাক্ষাৎ সোফিয়া লোরেন। অগত্যা আমতা

আমতা করে বললাম, তা হলে ও-ই বা বুড়ো ফিলপটকে বাছল কেন?

সঞ্জীব বলল, টাকা। আবার কী?

বললাম, ও তো পাগলি, ওর কি টাকার ভাবনা আছে?

সঞ্জীব ফুঁসে উঠল, নেই আবার! ওর গায়ের গয়নাগুলো দেখেছিস কখনো? হিরে বসানো সব ওই ফিলপটের দেওয়া।

জিজ্ঞেস করলাম, ফিলপটের বউ নেই?

সঞ্জীব বলল, একটা নয়, তিন-তিনটে। একটা লণ্ডনে, একটা আলমোড়ায়, আরেকটা মৃত। রেচেল রক্ষিতা মাত্র, তবে ওকেই নাকি সাহেব সবচেয়ে ভালোবেসেছেন জীবনে।

আমি একেবারে তাজ্জব হয়ে গেছি। বললাম, তুই এতসব জানলি কোত্থেকে?

অনেকক্ষণ নীরবে রহস্যের হাসি হাসল সঞ্জীব। শেষে আমার কৌতূহলের বাঁধ যখন ভেঙে পড়ল বলে, ও আস্তে আস্তে বলল, কে আর বলবে? রেচেলই বলেছে।

আমি আতঙ্কে, ঈর্ষায় আর্তনাদ করে উঠেছিলাম, রেচেল! সঞ্জীবও আমার প্রতিক্রিয়া দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল। বলল, অত এক্সাইটেড হওয়ার কী হল? যেন ভূত দেখলি!

আমি যথাসম্ভব নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, কিন্তু রেচেল তো পাগলি, ও তোকে এতসব বলে কী করে? আর বলেই বা কেন?

সঞ্জীব সবে প্রি-ইউনিভার্সিটি পড়া শুরু করেছে, ফলে টুকটাক সিগারেট ফোঁকাও ধরেছে। একটা কাঁচি ধরাতে ধরাতে বলল, কারণ আমি ওর প্রেমিক।

সঞ্জীব কথাটা বলেছিল খুব স্বাভাবিকভাবেই, কিন্তু তাতেও আমার বুকের ভিতরটা যেভাবে মুচড়ে উঠেছিল তা আজও আমি ভুলতে পারিনি। মনে মনে ভাবলাম, ওয়ার্ল্ড ফেমাস টম ফিলপটের মিস্ট্রেসের প্রেমিক একটা চ্যাংড়া ছোকড়া! ছি! ছি! ছি!

মুখে বললাম। তুই কি রেচেলকে ভালোবাসিস?

সঞ্জীব ওর দু-হাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে জড়ো করে শাম্মি কাপুর স্টাইলে চোখ বুজে আদুরে গলায় বলল, খু-উ-ব! এরপর আমি আর কথা বাড়াইনি, পরীক্ষার পড়া আছে বলে চুপকি দিয়ে বাড়ি চলে এসেছিলাম।

আর, এর ক-দিন বাদে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পুরোনো বইয়ের দোকানে রহস্য রোমাঞ্চের বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ করে হাতে উঠে এল এক পুরোনো, শ-দুয়েক পাতার পেপারব্যাক, যার ময়লা প্রচ্ছদটার দিকে আমি চেয়ে রইলাম কতক্ষণ কে জানে। চটকা ভাঙল প্রৌঢ় দোকানির টিপ্পনীতে, ভাই, হয় এটা নিন, নয় ছাড়ুন। অতক্ষণ ধরে কভার দেখলে হয়?

আমি বিব্রত স্বরে বললাম, না, এটা নেব ভাবছি। কত পড়বে?

দিন, পাঁচসিকে। সন্ধ্যের মুখে এয়েচেন।

আমি সাততাড়াতাড়ি দাম চুকিয়ে বইটা নিয়ে বাড়িমুখো হলাম। আর চলতে চলতে কেবলই প্রচ্ছদটা দেখছি। টাইটেলে লেখা 'আ লাইফ ইন দ্য জাঙ্গলস' আর লেখকের নামের জায়গায়? টম ফিলপট! প্রচ্ছদচিত্রে মরা বাঘের গায়ে পা রেখে মাথায় শোলার টুপি, পরনে খাকি শর্টসের সঙ্গে খাকি হাফশার্ট আর হাতে রাইফেল-ধরা তরুণবয়সি টম ফিলপট। আমি উত্তেজনার বশে বারবার প্রচ্ছদটাই দেখছি, অসম্ভব কৌতূহলে ঝলসে গিয়েও ভিতরের পাতায় যেতে পারছি না। জোরকদমে হাঁটতে হাঁটতে একসময় মনে হল বইটা যেন ক্রমশ ওজনে ভারী হচ্ছে, আর উষ্ণ হয়ে উঠেছে। বই নয়, আমার হাতে আলতো করে ধরা যেন এক ব্যাঘ্রশিশু!

একরাতে একটা গোটা ইংরেজি বই পড়ার অভিজ্ঞতা সেই প্রথম। ঘোরের মধ্যে পড়ছি যখন, আমার জীবন কাটছে জঙ্গলে। শেষে নিঃশ্বাস বন্ধ করে

বসে রইলাম শেষের দিকের একটা পরিচ্ছেদ শেষ করে। আমার সমস্ত গায়ে কাঁটা, আর দেওয়াল ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে তিনটে। আমি সেই পরিচ্ছেদের একটা জায়গা থেকে পড়তে শুরু করলাম:।

গোরুমারা জঙ্গলের উপকণ্ঠে কিছুদিন ধরেই প্রবল উত্তেজনা। একটা রয়্যাল বেঙ্গল বাঘিনি মাঝেমধ্যেই লোকালয়ে ঢুকে পড়ে ত্রাসের কারণ হচ্ছে। কীসের সন্ধানে সে যে গ্রামে ঢোকে। তাও একটা রহস্য। কারণ, মানুষ দূরে থাক, গোরু-ছাগল-শুয়োরের উপরও তার থাবা পড়েনি। সে নিঃশব্দ চরণে এসে নিঃশব্দে প্রস্থান করে। তাকে দূর থেকে দেখে অবশ্য বেশ কিছু নারী-পুরুষ মূর্ছা গেছে।

দার্জিলিং-এর প্ল্যান্টার্স ক্লাবে এই তথ্যগুলো দিয়ে ডিএসপি পুরুষোত্তম পাঠক বললেন, এখন আপনাকে মাঠে নামতেই হচ্ছে, মিস্টার ফিলপট।

আমি ব্যাপারটা ঘাঁটাতে চাইছিলাম না, তাই বললাম, আমার বন্দুক পাঁচ বছর ঘুমোচ্ছে। ওকে জাগানোটা কি ভালো হবে?

পাঠক বললেন, সবাই মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছে দিসুরিয়া গ্রামে। পরে হয়তো আপশোস করতে হবে।

বললাম, বাঘিনি কিন্তু এখনো ম্যানইটার নয়। ওর হয়তো অন্য সমস্যা আছে।

পাঠক উত্তর দিলেন, সেই সমস্যাও তো আপনিই তদন্ত করতে পারেন। অন্য কারও উপর তো ভরসা নেই আমার।

আজও মনে পড়ে বাঘিনির সেই ব্যথিত চাহনি। গুলিটা লাগার পর যে মস্ত লাফটা আশঙ্কা করেছিলাম, কোথায় সেই লাফ! বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো একবার শুধু ঘুরে দেখে সবুজের মধ্যে হারিয়ে গেল ও। আমি অবাক হয়ে গেলাম পাঁচ বছর শিকারে এসে এত সহজে অমার এত অব্যর্থ নিশানায়। বাঘিনির ওই করুণ চাহনি থেকে আমি জেনে গিয়েছিলাম এর চোখের আলো নিভে আসছে।

আমরা শেষ অবধি বাঘিনিকে মৃত অবস্থায় পাই এক গুহার সামনে। আর ওর গায়ে ঠেসান দিয়ে বসে অঝোরে কেঁদে চলেছে অপরূপ সুন্দরী এক মানবশিশু। আমার যখন বাঘিনির পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, দেড়-দু বছরের মেয়েটি সমানে চেষ্টা করে যাচ্ছে তাকে ঘুম থেকে জাগাতে। আমার হাত থেকে রাইফেল খসে পড়ল, সে রাইফেল আমি আর মাটি থেকে ওঠাইনি। চোখের সামনে ভাসছে শুধু 'পিয়েতা'-র দৃশ্য, মা মেরি-র কোলে মৃত যিশু। এখানে শুধু মা মেরিই মৃতা, তার কোল চাইছে শিশু।

বাঘিনির লোকালয়ে যাওয়ার রহস্য এবার ভাঙল। মানুষের বাচ্চার উপযোগী খাদ্যের সন্ধানে ওর দিসুরিয়ায় ঢু মারার ঘটনাগুলো হঠাৎ অলৌকিক ঠেকল। আমি বহুক্ষণ বাঘিনির মাথায় হাত বুলিয়ে শেষে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে চলে এলাম।

কিন্তু দার্জিলিং ফিরলাম না, কালিম্পং-এ আমার বন্ধু সিস্টার পার্টনের কাছে শিশুটিকে রেখে বললাম, এর বাপ কে, মা কে কিস্যু জানি না। এখন থেকে তুমিই এর বাবা, তুমিই এর মা। খরচ যা জোগানোর আমিই জোগাব। তুমি কিন্তু এর জগৎ সংসার।

সিস্টার পার্টন জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আপনি একে পেলেন কোত্থেকে?

বললাম পুরো ব্যাপারটা। ওর চোখ দুটো কাচের গুলির মতো গোল হয়ে গেলে। বলল, আমি বিশ্বাস করি না।

বললাম, তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, তা হলেই হবে। এসব সাধারণ ব্যাপারে তোমার বিশ্বাস করলেও চলবে।

সিস্টার পার্টন জিজ্ঞাসা করল, এর নাম কী হবে?

বললাম, ও তো তোমার মেয়ে, তাই পার্টন।

-ও তো পদবি হল, আর নাম?

-রেচেল!

সিস্টার পার্টন একটু থমকে গেল যেন, রেচেল? আপনি তো দেখছি নাম ঠিক করেই এসেছেন। তবু জিজ্ঞাসা করছি, রেচেল কেন?

বললাম, কারণ ওটা আমার মায়ের নাম। জন্মমুহূর্তে যাকে হারিয়েছিলাম।

.

কৌতূহলে দগ্ধ হচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু শেষ তিনটে পরিচ্ছদ তখনই পড়ে ফেললাম না। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বইটা বন্ধ করে মাথার পাশের টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলাম। আর তারপর পরের দিন সন্ধ্যায় গুটিগুটি রওনা হলাম ১৪ নম্বর বাড়ির দিকে।

অন্ধকার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম রেচেলদের ফ্ল্যাটে। কড়া নাড়তে নাড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, শেষে যখন মহিলার দাই রুক্মিণী এসে দরজা খুলল—কী চাই? বললাম, রেচেল মেমসাহেবের সঙ্গে একটু কথা আছে। রুক্মিণী বলল, উনকা হালাত খারাব হ্যায়। কুছ নহি বোল পায়েগি।

বললাম, একটু দেখতে পারি ওকে? রুক্মিণী সন্দেহের চোখে অনেকক্ষণ দেখল আমাকে, তারপর ছোট্ট করে বলল, আও। অন্ধকার করিডর দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, সঞ্জীব খুব আসে, তাই না? অন্ধকারে তো মুখ দেখতে পেলাম না। তবু কথার ভঙ্গিতে মনে হল ওর ভুরুজোড়া কপালে ঠেকে গেছে—কৌন সঞ্জীব!

আমি আর কথা বাড়ালাম না, মানে মানে গিয়ে দাঁড়ালাম বাড়ির পিছন দিককার বারান্দায়, যেখানে একমনে তারার আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে রেচেল। রুক্মিণী মেমসাব! বলে ডাকতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, আর ওর পাশে আমাকে দেখে এক অদ্ভুত চাহনিতে চেয়ে রইল বহুক্ষণ।

আর ওই চাহনিতেই আমি আমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। জানলাম, সঞ্জীব কখনো কোনোদিন ওর সঙ্গে একটি বাক্যও বিনিময় করেনি, ওর সব গল্পই মনগড়া। না হলে এই চাহনির কথা ও বলতই। জানলাম, রেচল টম ফিলপটের রক্ষিতা নয়, কুড়ি বছর আগে জঙ্গলে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটিই ও। জানলাম রেচেলের পাগলামি রাঁচির পাগলা গারদের পাগলের পাগলামি নয়। ওর মধ্যে একটা জঙ্গলের প্রাণী আর একটা শহরের প্রাণী পাশাপাশি বসবাস করে। আর এই সবকিছু জানিয়ে দিল একজোড়া চোখ আর তাদের চাহনি।

রেচেলের তাকানোর মধ্যে একটা বাঘিনির চাহনি দেখলাম। কিন্তু সে চাহনিতে হিংস্রতা নেই, বিপন্নতা আছে। মনে পড়ল, ফিলপটের

আত্মজীবনীতে গুলিবিদ্ধ বাঘিনি তিরখি-র শেষ চাহনির কথা। ফিলপটের মনে হয়েছিল, ওই চোখ দুটো যেন চোখ নয়, সরোবর। যেখানে তিরখি-র হৃদয় ডুবে আছে। আমি আস্তে করে ডাকলাম, রেচেল! রেচেল কিন্তু সেই একইভাবে তাকিয়ে রইল। দেখলাম, ওই বাঘিনি-চাহনির বিপন্নতা কেটে একটু একটু করে হিংস্রতা ফুটে বেরচ্ছে। অনেকক্ষণ দেখে ফের ডাকলাম, রেচেল! আর অমনি বাঘিনির মতোই যেন থাবা বিস্তার করে উঠে দাঁড়ল রেচেল, আর গর্জন করল, গেট আউট! অর আই'ল কিল ইউ!

রেচেল দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছিল আমাদের দিকে। রুক্মিণী ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল। আর আমি অন্ধকার করিডর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম সিঁড়ির দিকে। ছিটকিনি নামিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলছি আর ভাবছি, এই এসে পড়ল বুঝি পিঠে ওর নখ; কিন্তু না কানে ভেসে এল রুক্মিণীর কান্না আর রেচেলের কিল চড়ের আওয়াজ। হঠাৎ মনে হল, দাইকে এভাবে বিপদে ফেলে চলে যাওয়া ঠিক না। দুরুদুরু বুকে ফের অন্ধকার করিডর পেরিয়ে ফিরে গেলাম বারান্দায়।

কিন্তু, ওরই মধ্যে সব ফের শান্ত। মাটিতে উবু হয়ে বসে রুক্মিণী আঁচলে চোখ মুচ্ছে, আর ওকে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঘষে আদর করে যাচ্ছে রেচেল। আদরের ধরনটা মানুষের নয়, জঙ্গলের জীবের। আমি দু-দন্ড দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে ফের নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম ১৪ নম্বর বাড়ি থেকে।

ওই রাতে আমি ফিলপটের বইয়ের শেষ তিন পরিচ্ছেদ শেষ করলাম খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানার মাথায় টেবিল ল্যাম্পের আলোয়। কেন যে আমি এই পরিচ্ছেদগুলো আগের রাতে তুলে রেখেছিলাম, ঈশ্বর জানেন। পরের দিন পড়া শুরু করেই টের পেলাম যে বইয়ের পূর্বের অংশের সঙ্গে আমূল তফাত এই শেষ তিন পরিচ্ছেদের। পূর্বের দিকের সেই প্রতিভাবান, কিছুটা আত্মম্ভরী

মানুষটা যেন নিমেষে উধাও হল। সে-জায়গায় এক করুণ, বিপন্ন মানুষ ফুটে উঠতে শুরু করল। জঙ্গলের পত্রপল্লবের বিস্তারে যেন একটু হারিয়ে যেতে থাকল দিনের সূর্য। শেষ পরিচ্ছেদে তো রীতিমতো ধ্বনিত হচ্ছে কান্না। আমি কীরকম আটকে গেলাম একটি বাক্যে—দীর্ঘদিন নিজের সঙ্গে তর্ক করার পর একদিন লিখেই দিলাম লণ্ডনে স্ত্রী এস্থারকে, ডার্লিং, অবসর জীবনটুকু ফের লণ্ডনে কাটানোর স্বপ্নটা বোধ হয় বাতিল হয়ে গেল।

নিঃসন্তান ফিলপট দম্পতির স্বপ্ন ছিল অবসর জীবনের সন্ধ্যেগুলো ওরিয়েন্টাল ক্লাবে কাটানোর। ফিলপটের আত্মজীবনীতে আর কোনো স্ত্রীর উল্লেখ না দেখে বুঝলাম ওর তিন তিনটে বিয়ের কাহিনিও সঞ্জীবের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত। বইটা পড়তে পড়তে বহুবার রাগে জ্বলে উঠেছি সঞ্জীবের উপর। পরে নিজেকে শান্ত করেছি এই ভেবে যে, রেচেলকে নিয়ে উদ্ভট কল্পনার জাল বোনা আমাদের পাড়ার প্রসিদ্ধ কালচার। ফিলপটকে মাঝে মাঝে দূর থেকে এক-আধ ঝলক দেখলেও পাড়ার কেউই সম্ভবত কথা কয়নি ওর সঙ্গে। আর রেচেল? চিড়িয়াখানায় দূর থেকে খাঁচার বাঘ দেখার মতোই সম্ভবত সবাই দূরের জানলা থেকে দেখেছে ওকে। যেমন, আমি দেখেছি সাতবাড়ি দূর থেকে, ছাদের নির্জনতা থেকে। তাতেই বুঝতাম মেম বড়ো সুন্দর, কিন্তু ওভাবে কখনো ওর বাঘিনি চাহনির সামান্য আঁচও পাইনি।

দেখলাম আগের দিনে দেখা সেই চাহনির কথা লিখেছেন ফিলপটও। আমি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়লাম–

কালিম্পং-এ রেচেলকে রাখা নিরাপদ মনে হল না। প্রথমত, ওকে জঙ্গলে খুঁজে পাওয়ার কাহিনিটা একটু একটু করে শহরে ছড়িয়েছে। দ্বিতীয়ত, অর্ফানেজের অনেকেই বলাবলি শুরু করেছে, ওর চাহনি ও কিছু কিছু আচরণ নিয়ে। ওর তাকানো নাকি একেক সময় বাঘিনির তাকানো হয়ে ওঠে। এত অবধিও ঠিক

ছিল, কিন্তু নতুন উপদ্রব হয়েছে এক ইহুদি দম্পতির কনভেন্টে আসা-যাওয়া। তাদের কাছে উড়ো খবর এসে পৌঁছেছে যে, তাদের হারিয়ে যাওয়া কন্যাটি নাকি জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়ে আপাতত কনভেন্টে আছে। সিস্টার পার্টন ওদের কথাবার্তায় বিশেষ বুঝ মানছে না, ওর ধারণা কাগজের রটনা থেকে ওরা গল্প ফেঁদে বাচ্চাটাকে হাতাতে চাইছে। কিন্তু, আমি ভিতরে ভিতরে প্রমাদ গুনছি, এ শিশুকে প্রাণ থাকতে আমি কারও হাতে তুলে দিতে পারব না। কুড়িয়ে পাওয়ার সময় ওর গলায় যে ছোট্ট কারে-বাঁধা লকেট দেখেছিলাম, তাতে বাস্তবিক হিব্রুতে কী সব লেখা ছিল। আমি বাচ্চাটিকে স্নান করানোর সময় সন্তর্পণে সেটা সরিয়ে দিয়েছি।

উপরিউক্ত তৃতীয় কারণটির জন্যই রেচেলকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাওয়া স্থির করলাম। ইতিমধ্যে লণ্ডন থেকে চিঠি এল এস্থারের, সে শেষজীবন আমার সঙ্গেই কাটাতে চায় ভারতে, তবে কলকতায় নয়, দার্জিলিং-এ। বলা বাহুল্য, এতে যে আমি কী স্বস্তি পেলাম ভাষায় বোঝাতে পারব না। কালবিলম্ব না করে আমি দার্জিলিং-এ একটা বাংলো কেনার উদ্যোগ নিলাম।

কিন্তু হায় কপাল, যা নিয়ে স্বপ্ন দেখা যায় তার কতটুকুই বা বাস্তব হয়। প্রথম রাত থেকে এস্থার ভয় পেতে লাগল রেচেলের ব্যাঘ্রচাহনিকে। রেচেলও দেখলাম বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না এস্থারকে। শেষে একদিন নৈশভোজের সময় খাবার টেবিলের এপার থেকে ওপার জন্তুর মতো ঝাঁপ দিয়ে নখ দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিল ওর মুখ। আমি সেদিনই মনস্থ করলাম, একবার দেখা করব সেই ইহুদি দম্পতির সঙ্গে যারা ক্রমাগত দাবি করে গেছে। শিশুটিকে।

সিস্টার পার্টনের কাছে শুনলাম যে, রেকস্টাইন দম্পতি মধ্য কলকাতার বাসিন্দা, সিস্টার ঠিকানাও দিল। আমি সেই বাড়ি, ১৪ নম্বর মিন্টো রো-তে, যেদিন হাজির হলাম তার ক-দিন আগেই মধ্যবয়সী দম্পতি সন্তানশোকে বিষ

খেয়েছে। কেউ কেউ বললে, বিষে নয়, ওরা মরেছে গলায় দড়ি দিয়ে। সারা ফ্ল্যাট দেখলাম লন্ডভন্ড হয়ে আছে, কোনো জিনিসটাই ন্যায্য চেহারায় নেই। আর ওই উলটুল আসবাবপত্রের জঙ্গলে হঠাৎ আমার নজরে এল একটা ছোট্ট ফ্রেমে বাঁধানো শিশুর ছবি। বয়স আর কত হবে? এক কি দেড়। কিন্তু, ওই একঝলকেই ছবির বাচ্চাটাকে চিনে ফেলা যায় রেচেল বলে। আমি ছবিটা তুলে নিয়ে বাড়ির কাজের মেয়েটাকে বললাম, এই কি ওদের হারিয়ে যাওয়া মেয়ে?

মেয়েটা আমার কথা শেষ হতেই একটা বুকফাটা চিৎকার জুড়ে কেঁদে উঠল, হ্যাঁ, সাব, ও-ই মিসিবাবা। বৃহৎ কোশিশকে বাদ ও আয়ি থি। সাহাব, অউর মেমসাবকো এক হি বচ্চা।

জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু ও হারিয়ে গেল কী করে? মেয়েটা বলল, কুছ পতা নাহি সাব। শুনা এক পহাড়ি জঙ্গলমে সাবকা গাড়ি উঁচাইসে গির পড়ি। সাব, মেমসাব বেহুস থে, হাঁসপতালমে চোখ খোলকে দেখে কি মিসিবাবাকা পতা নহি।

কথা শেষ করেই মেয়েটা ফের কান্না জুড়ল। আমি ওকে কাঁদতে নিষেধ করে বললাম, তোমার মিসিবাবা যদি ফিরে আসে, তুমি থাকবে এখানে?

মেয়েটা বিস্ময় আর অবিশ্বাস-মেশা চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকাল, তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার পায়ে, ম্যাঁয় আখরি শ্বাস তক উসকো পালুঙ্গি, সাব। মেহেরবানি করকে উসে লওটা দিজিয়ে।

আমি ওকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে বললাম, আমি তোমাদের মেয়েকে ফেরত দিতেই এসেছি।

বেরোবার মুখে জিজ্ঞেস করলাম, কত মাসে বাচ্চাটা হারিয়ে যায়? কাজের মেয়ে রুক্মিণী বলল–দেড় বছর। মনে মনে হিসেব কষে বুঝলাম রেচেলকে ছ-মাস কি এক বছর পালন করেছিল ওর বাঘিনি মা। হঠাৎ ডান হাতের তর্জনীটি ভীষণ জ্বালা-জ্বালা করতে লাগল।

এরপর রেচেলকে নিয়ে যে দিন ফিরলাম রেকস্টাইনদের ফ্ল্যাটে রুক্মিণীকে দেখে অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল রেচেল। তারপর নিঃশব্দে হেঁটে গিয়ে ওর কোলে উঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। রুক্মিণী ওর শাড়ির কোঁচড় থেকে এবার বার করল একটা হিরের হার আর দুল। বাচ্চাকে হারটা পরাতে পরাতে বলল, মেমসাবনে ইয়েচিজ মুঝে ইন্তেকালকে দিন দে গয়ি। উনকা বহেন অউর দামাদনে সারা ঘর ছান মারা ইস হিরাকে লিয়ে। ম্যায়নে কবুল নহি কি। মুঝে বিশ্বাস থা কি বাচ্চা একদিন ওয়াপস আয়েগি। তব উসকো লওটাউঙ্গি।

বলে রেচেলকে চুমোতে চুমোতে ভরাতে লাগল রুক্মিণী। বইটা শেষ করে টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কখনো ও বাড়িমুখো হব না। এর দু-বছর পর ওই পাড়া ছেড়ে আসা অবধি আমি নিজের কাছে নিজের কথা রেখেছিলাম। কিন্তু, ওই দু-বছরের মধ্যেই দু-দুটো ঘটনা ঘটে গিয়েছিল রেচেল সংক্রান্ত। যা মন থেকে মুছে যাওয়ার নয়।

এক, সঞ্জীবের সঙ্গে বন্ধুত্বের ইতি, যার অনেকখানি দায়িত্বই আমার। রেচেলদের বাড়ি থেকে ওভাবে পালিয়ে আসার পর একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম ওকে, তোর বান্ধবীর কী খবর? ও থতোমতো খেয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোন বান্ধবী? বললাম, আবার কার কথা বলছি তাহলে! ও

বলল, ক-দিন যাওয়া হয়নি, যেতে হবে আজকালের মধ্যে। বললাম, পারলে আজই যা। বড্ড তোর কথা বলছিল সে দিন।

দপ করে কীরকম নিভে গেল ছেলেটা। নার্ভাসনেসের মাথায় একটা কাঁচি ধরিয়ে বসল। তারপর নিজের পায়ের ডগার দিকে তাকাতে তাকাতে বলল, চলি।

আমাকে কিন্তু কীরকম জিঘাংসায় পেয়ে বসেছিল। বাক্যবাগীশ সঞ্জীবের কথা হারিয়ে গেছে দেখেও বলতে ছাড়লাম না, টম ফিলপটের একটা অটোবায়োগ্রাফি পেয়েছি। চাইলে উলটে পালটে দেখতে পারিস, প্রেমিকাকে বুঝতে সাহায্য করবে।

একরাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সঞ্জীব কথার উত্তর না দিয়ে চলে গেল। তখনো বুঝিনি ও আর কখনো কথা কইবে না আমার সঙ্গে। আর আমারও কেন জানি না কোনোদিন ইচ্ছে হল

ওর সঙ্গে সম্পর্ক মেরামত করার। অথচ বুকটা কীরকম হু হু করে উঠল খবরের কাগজের একটা খবরে, বেশ ক-বছর পর। একই সঙ্গে প্রবল গৌরব বোধও হল সঞ্জীব এককালে আমার বন্ধু ছিল বলে। খবরে জানলাম, কচ্ছ ও ছাম্বের পাক-ভারত যুদ্ধে ওর ন্যাট বিমানে শত্রুদের বেশ কিছু প্লেন ধ্বংস করে তরুণ বৈমানিক সঞ্জীব দত্ত বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ততদিনে আমাদের বাসাবদলের তোড়জোড় চলছে, রোজ সন্ধে নামলেই বুকটা কীরকম মোচড় দিয়ে ওঠে। হায়, এইসব দৃশ্য, মুখ মানুষ সম্পর্ক ছেড়ে চলে যেতে হবে। রাস্তায় যাকে পাই তার কাছ থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিই।

এভাবে একদিন মিন্টো রো-র বন্ধুদেরও হাত নাড়তে গেলাম। পাড়া ছাড়তে মোটে চারদিন বাকি।

হঠাৎ দেখি বিশাল ভিড় ১৪ নম্বর বাড়ির সামনে। যাকে বলে লোকে লোকারণ্য। বুকটা কেঁপে উঠল কীরকম, লোরেন সুইন্টনদের বাড়িতে কিছু ঘটল নাকি। ওদের ওখানে তো ঝামেলা লেগেই আছে নিত্য। মদোমাতালদের নিয়েই তো কারবার ফ্যামিলিটার।

একটুক্ষণ পর ফের ভিতরটা আনচান করতে লাগল। তাহলে রেচেলের কিছু হল না তো আবার।

দ্বিতীয় আশঙ্কাটাই সত্যি হল, তবে রেচেলের কিছু হয়নি, যদিও ঘটনাটা ওকে নিয়েই। শুনলাম, তিন হপ্তা খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করেছিল রেচেল। টম ফিলপটকে সহ্য করতে পারত না, দেখলেই বলত, তোমার চোখের মধ্যে আমি একজন খুনিকে দেখতে পাই।

ফিলপট জিজ্ঞেস করত—কার খুনি।

রেচেল বলত, আমার মা-র খুনি।

ফিলপট বলত, তোর মা নিজের হাতে প্রাণ নিয়েছে। জিজ্ঞেস কর রুক্মিণীকে।

তখন চিৎকার করে প্রতিবাদ করত রেচেল, না! তুমি গুলি করেছ মাকে।

সে দিনও এই তর্কই লেগেছিল পালক পিতা ও কন্যায়। লোরেন আর ওর মা-ও ছুটে এসেছিল ওদের মিটমাট করাতে। রেচেল সমানে বলে যাচ্ছিল, তোমরা

ওকে বার করে দাও এখান থেকে। এখানে হয় ও থাকবে, নয় আমি। আমি মা-র খুনির সঙ্গে থাকব না।

টম ফিলপট তখনই কোটের পকেট থেকে রেচেলের জন্য করা উইলটা বার করে টেবিলে রাখেন। তারপর অন্য পকেট থেকে রিভলবার বার করে নিজের মাথায় শুট করেন। মৃত্যুর আগে ওঁর শেষ কথা ছিল, রেচেল, আমি তোর মতো কাউকে কোনোদিন ভালোবাসিনি জীবনে। ঈশ্বর তোকে ভালো রাখুন!

মিন্টো রো ছেড়ে এলেও বিগত চল্লিশ বছর পাড়াটা আমার মগজে ভর করে আছে অতৃপ্ত আত্মার মতো। আমার স্ত্রী বলে, মিন্টো রো-র ভূত তোমায় জন্মেও ছাড়বে না। আজও আমি স্বপ্ন দেখি শুধু মিন্টো রো-কে। ইতিমধ্যে কত কত পাড়ায় থাকলাম, কিন্তু তারা কেউই আমার স্বপ্নে বাসা বাঁধল না। আর, মিন্টো রো-র মধ্যেও একটা বিশেষ বাড়ি তার নিজস্ব স্থাপত্য ও রহস্য নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকার বেলাভূমিতে পরিত্যক্ত বাতিঘরের মতো। আমার স্বপ্নের লাইট হাউস।

আর আজ খবরে বলছে, সে বাড়িটা আর শাবল-গাঁইতির কোপ থেকে রক্ষা পাবে না। বহুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর স্ত্রীকে বললাম, আজ ফিরতে দেরি হবে। একটু মিন্টো রো ঘুরে আসব। স্ত্রী বললে, কেন, ওখানে আবার কী ঘটল?

বললাম, ঘটেনি। ঘটতে চলেছে।

-কীরকম?

–কর্পোরেশন থেকে ১৪নং মিন্টো রো পেড়ে ফেলবে।

— সে আবার কী! যা শুনেছি তোমাদের থেকে, ও তো পোড়োবাড়ি নয়।

ক্লান্তস্বরে কোনোমতে বললাম, কে জানে, কোনো প্রমোটারই লেগে গেল পিছনে হয়তো। প্রমোটারই তো কর্পোরেশন চালায়।

শীতের অন্ধকারে চল্লিশ বছর পর ১৪ নম্বরে উঠতে উঠতে দিনবদলের কত অজস্র সুর। শুনতে লাগলাম। একতলার গঞ্জালভেস পরিবার উঠে গেছে, তাদের ফ্ল্যাটের দরজায় দেখলাম সাইনবোর্ড আটা-শাহু ইলেকট্রনিক্স'। তার উলটোদিকের ফ্ল্যাটে থাকত বাড়ির একমাত্র হিন্দু বাসিন্দা আড্ডি পরিবার। তামাক না ছাপাখানা কী যেন নিয়ে ব্যাবসা করত ওরা। সেখানে ঝুলছে সাইনবোর্ড–নৌরতন কেমিক্যালস। আমি দ্রুত পা চালিয়ে উঠে গেলাম দোতলায়।

না, এখানে লোরেন সুইন্টনরা বহুকাল নেই, ওদের মলিন দরজাটায় বর্তমান বাসিন্দাদের কোনো নেমপ্লেটও নেই। ওদের পাশে যে ফ্ল্যাটে শোনা যায় প্রায়ই আসতেন কিশোরী মার্ল ওবেরন, সে ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা। ভিতরটা ঘন অন্ধকার, এখানে প্রেতাত্মা ছাড়া আর কিছুর বাস সম্ভব না। আমি অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলাম রেচেলদের তলায়, আর অমনি বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস শব্দ শুরু হল। এতদিন পর ওরা কি আর থাকবে? আর থাকলে...

চিন্তাটা কোথাও পৌঁছোনোর আগে ফ্ল্যাটের বেল টিপে বসেছি। তারপর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছি। রেচেল কি বেঁচে আছে? বেঁচে থাকলে ও কি সুন্দর আছে? ওর কত বয়স হবে এখন? ওর চোখ...

খটাস করে দরজা খুলে গেল আমার চিন্তার মধ্যে। হাতে একটা লম্ফ নিয়ে এক বৃদ্ধা, যাকে এতকাল পরেও, চেহারা ও চুলের সমস্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও আমার রুক্মিণী বলে চিনতে অসুবিধা হল না। আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই ও বলল, আইয়ে ডাগডারসাব, আপহি কা ইন্তেজারমে থে হাম। রেচেলকা বিমারি আউর ভি বঢ়ি।

বুঝলাম বেচারি রুক্মিণীর দৃষ্টিশক্তি গেছে, এই অন্ধকারে স্যুট-পরা, অ্যাটাচি হাতে আমাকে ডাক্তার ঠাউরেছে। আমি নিঃশব্দে ওর পিছন-পিছন গেলাম। খুব ইচ্ছে করছিল ওকে জিজ্ঞেস করি, এ বাড়ি ভাঙা হলে তোমরা কোথায় যাবে? কিন্তু তার আগে ওই জিজ্ঞেস করে বসল, ডাগডারসাব, ক্যা ইয়ে সচ হ্যায় কি ইয়ে মকান তোড়া যায়েগা! বললাম, তাই তো শুনেছি। তোমরা কিছু শোননি?

আমরা করিডর তখনও শেষ করিনি, রুক্মিণী ঘুরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করল, সাব আপ হি না বোলে থে কি রেচেল বিটিয়া কি জিন্দেগি খতম হোনেওয়ালি হ্যায়। জেয়াদা সে জেয়াদা দো মহিনা?

আমি ঘেমে উঠেছি ওই শীতের মধ্যেই। আমি তো কিছুই জানি না এসব। অথচ কৌতূহলে আনচান করছে মনটা। লাঠি না ভেঙে সাপ মারার জন্য বললাম, তো?

রুক্মিণী বলল, অব তো ও বঁচেগি নহি ডাগডারসাব।

বললাম, কেন?

—সুবহে নিউজপেপার পড়কর বিলকুল থক গয়ি বিটিয়া।

সর্বনাশ! আমি ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠলাম। রেচেল তাহলে জেনে গেছে এ বাড়ির পরমায়ু ফুরিয়ে গেছে।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে শব্দ এল গরর গরর। যেন কোনো বেড়াল গজরাচ্ছে। রুক্মিণী বাতি নিয়ে পথ দেখিয়ে আমায় ঢুকিয়ে নিয়ে গেল ঘরটায়। লাল কাপড়ের শেড দেওয়া টেবিলল্যাম্পের আলোয় দেখলাম বিছানায় গুটিয়ে একটা বৃহৎ বিড়ালির মতো বসে রেচেল। কুটি কুটি করে ছিঁড়ে খবরের কাগজটার উপর হাত দুটোকে থাবার মতো করে চেপে ধরে গর্জে যাচ্ছে মহিলা। আরও স্পষ্ট করে নজর করতে বুঝলাম আমার ভুল হয়েছে, বিড়ালি নয়, সাক্ষাৎ বাঘিনির মতো নিজের আলো-আঁধারি জুড়ে বসে আছে রেচেল।

আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে পড়েছি। দেখি মেয়েটার সেই কোঁকড়া, কালো চুল সব ফুরফুরে সাদা হয়ে গেছে। চুল ঝরেও গেছে বিস্তর, ফলে কদমফুলের চেহারা নিয়েছে ওর মাথা। হাতের আঙুল সরু, লিকলিকে লম্বা হয়ে গেছে, তাদের নখগুলোও অস্বাভাবিক ধারালো ও লম্বা। মুখে ভাঁজ বিশেষ পড়েনি রেচেলের, কিন্তু স্তন দুটি শুকিয়ে মিলিয়ে গেছে পাঁজরে। ওর বসার ভঙ্গিও মানুষের মতো নয়, উবু হয়ে যেন নিজেকেই পাহারা দিচ্ছে জগতের লোক। আর ওর ওই দুই চোখ! সম্পূর্ণ বাঘিনি মায়া তাতে, কেবল পূর্বের সেই হিংস্রতায় জায়গায় এসেছে আতঙ্ক আর ভয়। আমাকে দেখে ভয়েও গর্জন করতে লাগল, ও তো আর আমাকে ডাক্তার বলে ভুল করছে না।

আমি ওকে শান্ত করার জন্য স্নেহের স্বরে ডাকলাম, রেচেল!

—রেচেলও ফের মৃদু গর্জন করল, গরর, গরর।

ফের ডাকলাম রেচেল!

-গররর! গররর!

-রেচেল!

-গররর!

গররর! পিছন থেকে রুক্মিণী বলল, আজ সুবহসে উসকি বাত বন্ধ হো চুকি হ্যায়। সির্ফ ইয়েহি আওয়াজ নিকল রহা হ্যায়।

জানি না হঠাৎ কী দুর্মতি হল আমার, আর নাম ধরে না ডেকে ওর নকলে গরর আওয়াজ দিলাম।

রেচেল যেন ঘাবড়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে ফের একটু যেন আদুরে স্বরে ডাকল গরর!

আমি ফের ডাকলাম গরর! যেন খেলায় মেতেছি। দেখলাম একটা হাসির ঝিলিক ওর ঠোঁটে।

আমি এক পা, দু পা করে এগোলাম ওর দিকে। আস্তে করে হাতের অ্যাটাচি কেসটা নামিয়ে রাখলাম মাটিতে। তারপর এগোচ্ছি...

হঠাৎ বিকট আওয়াজ করে একেবারে বাঘিনির মতো রেচেল লাফ দিলে আমার শরীর লক্ষ করে। আমি কিছু বোঝার আগেই ওর দেহটা এসে পড়ল আমার উপর, আর ওকে নিয়েই আমিও ছিটকে পড়লাম মাটিতে। কিন্তু কই, আমার তো লাগল না। মেয়েটার শরীরের কোনো ওজনই টের পেলাম না। মানুষ নয়, একটা বড়োসড়ো বেড়ালের ওজন। মাটিতে মোচড়ানো কান্না।

আমি মহিলার মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, ডোন্ট ক্রাই ডিয়ার, আই উইল টেক কেয়ার অফ ইউ।

রেচেল আমার কোলে ছোট্ট শিশুর মতো সঙ্কুচিত হয়ে যেতে যেতে ধ্বনি তুলল—গরর।

ওর শরীরে উষ্ণতা আর চোখের জলের ছোঁয়া পাচ্ছি আমি, আমার ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। আমি শুধু বলতে পারছি গরর! রেচেল আমাকে আরও নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরছে, গরর ধ্বনি তুলতে গিয়ে দম ফুরিয়ে এল ওর। বুঝলাম রুক্মিনী বলছে, সাব কুছ কিজিয়ে! বিটিয়া কা দম নিকল রহা হ্যায়।

কিন্তু আমি কী করব! আমি তো ডাক্তার নই। রুক্মিণীকে বললাম, এখানে ওর চিকিৎসা হবে না, ওকে হাসপাতাল নিয়ে যেতে হবে। এসো, আমার সঙ্গে এসো।

বলে রেচেলকে কোলের শিশুর মতো আগলে ধরে ঘন অন্ধকারের মধ্যেই দুদ্দাড় এগোচ্ছি সিঁড়ির দিকে। মিন্টো রো-টা পার করলেই তো ক্যাম্বেল হসপিটাল। যন্ত্রণায় বুক মোড়াচ্ছে আমারও, কিন্তু তাও কোথায় যেন এক অব্যক্ত আনন্দ। আমার কোলে এই মুহূর্তে রেচেল, থুড়ি বাঘিনি, থুড়ি স্বপ্ন। আমার সমগ্র বাল্য-কৈশোরকে বুকে ধরে আমি অন্ধকারে এগোচ্ছি, বাঘিনির কোনো সাড়াশব্দ নেই। পিছনে শুধু কান্না জুড়ে দৌড়োতে দৌড়োতে আসছে রাতকানা রুক্মিণী।